সৎ, দৃঢ়চেতা, বলিষ্ঠ

প্রভাত সিংহরায়

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার জানাশোনা অল্পদিনের, স্বল্প সময়ের জন্য। সেই অল্প আলাপচারিতায় তার মধ্যে সততা, দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ এক মানুষকে দেখেছি। যখন সবাই স্রোতের দিকে গা ভাসিয়ে দেয়, ভাববাদী দর্শনের ধারক ও বাহক বিবেকানন্দকে নিয়ে বামপন্থীরা নাচানাচি করে, তার বিরুদ্ধে বলতে ভয় পায়, তখন অশোকবাবুর চেষ্টাতেই 'উৎস মানুষ'-এর পাতাতে বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে লেখা বের হয়। 'হোমিওপ্যাথি যে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা' প্রকাশিত হয় তাও। আয়ুর্বেদ নিয়ে যখন গোটা সমাজ ও বাণিজ্যিক দুনিয়া গুণকীর্তন ও মহিমা প্রচার করে চলেছে 'উৎস মানুষ'-এ আয়ুর্বেদ নিয়ে বই লেখা হল। এই বইয়ের সারমর্ম হল আয়ুর্বেদ একটি মৃতবিজ্ঞান এবং এই চিকিৎসা একটি অসৎ ব্যবসায়িক চক্রের অধীন। অশোকবাবু ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার বুদবুদ্ তৈরি করার কারিগর। যখন সবাই বলছে ফ্রান্সের ক্যাপটেন জিদান খেলা চলাকালীন ইতালীর একজন খেলোয়াড়কে মাথা দিয়ে মেরে ঠিক করেনি, তখন অশোকবাবু সম্পাদকীয়তে লিখলেন জিদান যেটা করেছে ঠিক করেছে, এতে তার নিজের, তার দেশের এবং গোটা মানবজাতির মাথা অনেক উঁচু হয়েছে। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক। তসলিমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় মেকি বামপন্থীদের ওপর অশোকবাবুর তীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখেছি। মানুষের অধিকারের ব্যাপারে তিনি কত সচেতন ছিলেন, বোঝা যায় যেদিন সিঙ্গুরে পুলিশ ঢুকে গ্রামের কৃষকদের ওপর বীভৎস অত্যাচার করল। আমি অশোকবাবুকে ফোন করি এবং তাঁর আকুলতা আমি শুনেছি। পরবর্তীকালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম নিয়ে 'উৎস মানুষ'-এর পাতায় লেখা বের হয়। ইদানীং তিনি আর পারছিলেন না, বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন, বলছিলেন আর হয়তো উৎস মানুষ বের করা যাবে না। আমরা হই হই করে উঠতাম 'উৎস মানুষ' বের হওয়ার সপক্ষে। কিন্তু কি করে, কেমন করে বের হবে তার দায়দায়িত্ব নেওয়া থেকে, কয়েকজন বাদে আমরা বেশিরভাগই, একটু দূরে সরে থাকতাম। তার ফলে অশোকবাবুর ওপর চাপ আরও বাড়ছিল, আমরা সেটা বুঝতে চাইনি বা পারিনি। আজ মনে হচ্ছে, আমরাও হয়ত পরোক্ষভাবে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

অশোকবাবু চলে গেলেন, আমাদের দেখিয়ে গেলেন কীভাবে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায়, সমাজের গরিব ও খেটে খাওয়া মাটির কাছের মানুষদের বিজ্ঞানমনস্ক ও কুসংস্কারমুক্ত করা যায়। কৃষক, শ্রমিক, যারা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টিশীলতাকে অশোকবাবু মূল্য দিতেন এবং তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়াতে চিন্তাশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, পরিবেশসচেতন, কুসংস্কারমুক্ত, ধান্দাবাজিবিমুখ নরম মনের সরল এক মানুষকে আমরা হারালাম। এতে 'উৎস মানুষ'-এর বিরাট ক্ষতি হল। আশা করি হতাশা দূর হয়ে অচিরেই এই ক্ষতি পূরণ হবে, 'উৎস মানুষ' আগের মহিমায় উজ্জ্বল থাকবে।

ই-মেলে যোগাযোগ

রবীন চক্রবর্তী

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমার পরিচয় ঠিক কবে মনে নেই। মনে আছে 'উৎস মানুষ' শুরুর পর্বে কোনো এক সময় থেকে। গেল কয়েক বছর যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। দেখা সাক্ষাৎ প্রায় হতই না। যবে থেকে আমি এখানে-সেখানে যাওয়া বন্ধ করেছিলাম, সেই থেকে। অনেকের সাথেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। -ওর সাথেও।

কিছুদিন হল নতুন করে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। ইন্টারনেট-মানে ই-মেলের মাধ্যমে। বড় মজার মাধ্যম এটি। এর মাধ্যমেই যোগাযোগ রাখতাম অশোকের সাথে।

কেন এই প্রসঙ্গ তুললাম জানাই। আমাদের দেশে কমপিউটারে মেল লিখতে হয় ইংরেজি হরফেই। বাংলায় চিঠি, রোমান হরফে লিখতে হয়। এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম বাংলা হরফেও মেল লেখা যায়। যদি বাংলা লেখার সফ্‌টঅয়্যার থাকে। সেটা বিনি পয়সাতেই মেলে। যোগাড় করে ফেললাম সেই সফ্‌টঅয়্যার এবং বাংলাতেই মেল লেখা শুরু করে দিলাম। কিন্তু বিপদ হল যাকে লিখব তারও ওই সফ্‌টঅয়্যার থাকা দরকার। না হলে সে মেল পড়তে পারবে না। জনে জনে ধরে জ্ঞান দিতে শুরু করলাম, কী করে বাংলায় মেল লেখা যায় এবং তার জন্য কীভাবে বাংলা সফ্‌টঅয়্যার ডাউনলোড করতে হবে। সবাই চমৎকৃত। বাহবা দিতে লাগল। উৎসাহের বশে অশোককেও জানলাম সে কথা। সেও উচ্ছ্বসিত। বলল - 'রবীনদা, জবাব নেই'। কিন্তু তখন আঁচ করতে পারিনি, সেধে একটি বাঁশ নিয়েছি।

লিখব কি, বাংলা বানানের ঝকমারি নিয়ে নাজেহাল। যতদিন ইংরেজি হরফ ছিল-চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বাংলা হরফ হতেই বামাল কট্। অশোক আমার মেল-এ বাংলা বানান দেখে রে রে করে উঠল। ভুল ধরতে শুরু করল। এই নিয়ে খুঁতখুঁতুনি আমার একদম না-পসন্দ্। অশোককে জানিয়ে দিলাম-'দেখ, এটা উৎস মানুষের লেখা নয় যে, এখানে তোমার সম্পাদকগিরি ফলাবে'। হিমানীশ গোস্বামীর ভাষাতেই জানিয়ে দিলাম - 'আমি তোমার বানানের থোরাই কেয়ার করি। এ ব্যাপারে আমার স্বাধীনতায় কোনো রকম হস্তক্ষেপ আমি মানছি না, মানব না'। পরের মেলে অশোক জানিয়েছিল - 'সরি, ভুল হয়ে গেছে। আর অমন হবে না'। সেই থেকে যা ইচ্ছে বানান লেখার স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম। কিন্তু দুঃখ, অমন বানান লিখে ওর ধৈর্য পরীক্ষার বেশি সুযোগ পেলাম না।

অনন্য অশোক

সুজয় বসু

অশোক চলে গেল। অসময়ে, যাবার সময় তার তো এখন নয়, অনেক পরে। আরও জরুরি কিছু কাজ করে যাবার কথা, তা হল না। ওর হৃদযন্ত্রে একটা বিকলন ছিল যার সংশোধনের চিকিৎসা অমিল না হলেও দুষ্প্রাপ্য। তবু এই প্রতিবন্ধকতা নিয়েই ও যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছিল, নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য। ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবনযাত্রা সুবহ করে তুলতে যে যুক্তিসিদ্ধ মুক্তচিন্তার প্রয়োজন অশোক ছিল তার উপাসক ও প্রচারক। অনেক ভাবেই তার এই দৃঢ় বিশ্বাস সে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে, অক্লান্তভাবে। শারীরিক অসহযোগ সত্ত্বেও। লিখেছে নিজে, অন্য সহমতাবলম্বীদের দিয়ে লিখিয়েছে, ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে পত্রিকার অবয়বে। আর সেই পত্রিকা 'উৎস মানুষ' এক সন্নিষ্ট জীবনের অনুগমনের প্রতীক হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বছরের পর বছর এই পত্রিকা সম-আদর্শের মানুষদের দূর দূরান্ত থেকে এনে অকপট মত বিনিময় ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে এগিয়ে চলার পথের সন্ধান করেছে। তরুণরা উৎসাহিত হয়েছে। বিজ্ঞান-চেতনার প্রসার এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই কর্মকাণ্ড চলেছে কলকাতা শহর ছাড়িয়ে রাজ্যের অন্যান্য নগরে। কেন্দ্রে অশোক। সর্বস্তরের মানুষকে সে সংযুক্ত করেছে এক অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান আন্দোলনে। একমাত্র অশোকের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব। বলিষ্ঠ চিন্তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টি না থাকলে এই আন্দোলনের স্বাভাবিক নেতৃত্বে অশোক আসত না। তার এই অনন্য অবদানের জন্যই আমাদের অশোকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

আমার সঙ্গে অশোকের পরিচয় প্রথম কবে হয়েছিল ঠিক মনে নেই। তার দরকারও নেই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতা সময়কাল দিয়ে মাপা যায় না। প্রথম পরিচয়ে কাউকে কাউকে অনেক দিনের চেনা মনে হয়। আমাদেরও বোধহয় এমনই হয়েছিল। আমার কর্মক্ষেত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা বিজ্ঞান-ক্লাব তৈরি করেছিল যে ছাত্রশিক্ষক গোষ্ঠী তার মধ্যে আমিও ছিলাম। মাঝে মাঝে আলোচনাচক্র, কোনো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর বক্তৃতা, একটা বিজ্ঞান পত্রিকার অনিয়মিত প্রকাশনাই মূল কাজ। ঐ পত্রিকায় লিখেছি একটু আধটু। শুরু থেকেই অশোকের প্রতি অনুরাগ গভীর। তাই তার অনুরোধ আদেশের মতো মেনে নিয়ে পরমাণু শক্তির ওপর একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ বাংলায় লিখলাম 'উৎস মানুষ'-এর জন্য। পরমাণু-বিরোধী আন্দোলনের মিছিলে অশোকের সঙ্গে হেঁটেছি, তার সভায় বক্তৃতাও দিয়েছি। ও-ই আমাকে বিজ্ঞান মেলা, প্রদর্শনীতে নিয়ে গেছে। গণবিজ্ঞানের কাজকর্মে যেটুকু সামিল হয়েছে সেও ওরই অনুরোধ নির্দেশে। 'উৎস মানুষ' কে কেন্দ্র করে যে কর্মীগোষ্ঠী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তাদের সঙ্গে পরিচয়ও অশোকের মাধ্যমে। বিজ্ঞান চেতনায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা যে হারে বেড়ে ওঠা আমরা চাইছিলাম, তা হচ্ছিল না। নিরাশার কথাও আমাদের মধ্যে হয়েছে। বুঝতে পারছিলাম জনসাধারণের প্রায় সমগ্রটাই সংস্কারে আচ্ছন্ন যা থেকে মুক্তি দেওয়া বা পাওয়া অতি কঠিন কাজ। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কোথাও সামান্য ইতিবাচক কিছু ঘটলে উৎসাহ উদ্দীপনায় জোয়ার আসে। এগিয়ে চলতে প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক কারণে ইচ্ছাও দুর্বল হয়ে আসে। পত্রিকা প্রকাশেও সংকট দেখা দিতে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও কলেজস্ট্রীট বা কাছে কোথাও কোন ঘর বা আশ্রয় জোটানো গেল না। সীমিত আর্থিক সামর্থ্য। একটা স্থায়ী দুর্বলতা থেকেই গেল। এই পর্বে অশোকের মানসিক যন্ত্রণার অবধি ছিল না। বিষয়-ভিত্তিক সংখ্যা, তাও অনিয়মিত, এই রকম প্রকাশনায় 'উৎস মানুষ' টিকে রইল কিন্তু অশোকের অপার নিষ্ঠায় তার ঔজ্জ্বল্যে ঘাটতি ছিল না। শরীর অনুমতি দিত না কিন্তু সেটা উপেক্ষা করেই অশোক সাপ সম্পর্কে এমন মনোজ্ঞ এক ধারাবাহিক আলোচনা কলকাতা বেতার-এর সৌজন্যে প্রচার করল যার তুলনা নেই। গবেষণামূলক এই আলোচনায় সাপ নিয়ে অজস্র ভুল ধারণা এবং অহেতুক বৈরিতা নিরসনের জন্য অশোকের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবেশন শ্রোতাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পেয়েছে।

অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও সে মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা হারায়নি। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার চেষ্টায় সে ছিল ক্লান্তিহীন কর্মী। আমরা তার সঙ্গে থেকেছি কখনও কাছে, কখনও দূরে। তার লক্ষ্যে সে ছিল অবিচল। জীবনকে সে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে চলেছিল আপ্রাণ। অবিবেচক। মৃত্যু তাতে যতি টানল। যে অনন্যতায় অশোক একটা সুস্থ যুক্তিসিদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠায় তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তা নিঃসন্দেহে অতি বিরল। তার অনুপস্থিতি আজ তাই তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসাকে আরও গভীর করে তোলে।

উৎসে মানুষ

গত ১৭ নভেম্বর রাতে নিমতলায় অশোকদার প্রশান্ত মুখটির দিকে তাকিয়ে যা মনে হয়েছিল, কয়েকটি লাইনে তা পরে ধরে রেখেছি। অশোকদার স্মৃতির প্রতি এভাবেই আমি শ্রদ্ধা জানাতে চাই।

উৎসে মানুষ, অন্তে মানুষ
যাদের, তাদের
কিসের শোক ?
মৃত্যু কোথায় ?
এই তো জীবন,
এই তো লড়াই,
অশোকদার !

আর তাই,
যুক্তি দিয়ে যুদ্ধ চলুক
লেখায় লেখায় লড়াই থাক,
উৎস থেকে
অন্তে ছুটুক—
মানুষ, মানুষ, মানুষ ডাক !

অমিত চৌধুরি

আকাশবাণী বেঁধেছিল আমাদের

অমিত চক্রবর্তী

অশোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭৬ সালে। ওই বছরেরই শেষের দিকে আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগে চাকরি করতে ঢুকি আমরা দুজন। প্রায় সমবয়সী এবং সমমনস্ক। দুজনেই ভেবেচিন্তে কাজ করতে ঢুকেছিলাম অন্য কাজ বা গবেষণা ছেড়ে। বিজ্ঞান বিভাগ তখন আনকোরা। বিজ্ঞান বিষয়ক নিয়মিত সব অনুষ্ঠানের সম্প্রচার শুরু হবে ১৯৭৭ সালের পয়লা জানুয়ারি ; আমাদের মতন কয়েকজনকে নেওয়া সেই কারণেই।

আর একজন এসেছিলেন আমাদের দলে। কৃষ্ণা ঘোষাল, স্কুলের চাকরি ছেড়ে। চাকরিতে যোগ দেবার আগে রেডিও সম্পর্কে আমাদের কারোরই কোনো ধারণা ছিল না। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাঁদের দিয়ে কোনও বিষয়ে লেখানো-বলানো, স্ক্রিপ্ট লেখা, রেকর্ডিং, এডিটিং, প্রোডাকশনের সব কিছু ঠেকে শিখতে হয়েছে।

বিজ্ঞান নিয়ে বাংলায় সহজ করে বলার মতন লোক তখন হাতে গোনা ক'জন। আমি আর অশোক পালা করে রাজাবাজার আর বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের সব কটা বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের কাছে গিয়ে দরবার করতাম। আগেকার দিনে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যাঁরা বিজ্ঞান পড়াতেন, তাঁদের সিংহভাগই বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজটাকে খেলো মনে করতেন। মনে আছে, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পর্কে অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের বলেছিলেন, আরে উনি তো জ্ঞান-বিজ্ঞান কাগজে লেখেন-টেখেন, উনি আবার সায়েন্টিস্ট হলেন কবে! এইসব মানুষকে দিয়ে সাধারণের উপযোগী স্ক্রিপ্ট লেখানো একেবারেই সহজ ছিল না। কোনও একজন বিজ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানের মাস্টারমশায়ের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অশোক রেডিওর স্ক্রিপ্ট লেখাচ্ছে এই দৃশ্য এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই।

বিজ্ঞান প্রসারের সামাজিক গুরুত্বের জায়গাটা নিয়ে আমার আর অশোকের মধ্যে মতের অমিল ছিল না, বরং সেই কাজটা করার সুযোগ যে পেয়েছি, সেটাকে নিয়ে আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লাগার অনুভূতি ছিল। বিজ্ঞানমনস্ক না হলে যে সামনের দিকে এগোনো যায় না সেটা আমরা দুজনেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম এবং সকলের কাছে জাহির করতাম। একটা বিষয়ে আমাদের খানিকটা মতভেদ ছিল। আমি ভাবতাম বিজ্ঞানের তথ্য, খবরাখবর বেশি করে সাধারণ মানুষ, যাঁদের সেগুলি জানার তেমন উপায় নেই, তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়বে। কুসংস্কার কমবে। অশোক মনে করতো, কুসংস্কারগুলিকে, ধর্মীয় আচার আচরণগুলোকে সরাসরি আঘাত করতে না পারলে কোনও কাজ হবে না।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়েই আমাদের একটা বড় বিপত্তিতে পড়তে হয়। সেটা ১৯৭৮ সালের কথা। অশোকের পরিচালনায় 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসর' নামে একটি পাক্ষিক বেতার অনুষ্ঠান তখন প্রচারিত হত। ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় নানা প্রথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন বিশেষজ্ঞরা। যেমন শালগ্রাম শিলা আসলে কী এবং কীভাবে আরাধ্য হল। চড়কের সময় বাণ ফোঁড়া বা মহরমের সময় অস্ত্র নিয়ে নিজের শরীরে আঘাত করার প্রথা কেন এল—এইসব বিষয়। এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানেই লিঙ্গপূজার প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর। অনুষ্ঠান প্রচারের পর অনেক শ্রোতা প্রতিবাদ করেন এবং আমরা তার যথাযোগ্য জবাব দিই। এরপরই ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে আমাদের বিজ্ঞান বিভাগের কর্মীদের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় এবং আমরা তখনই জানতে পারি—দেশের এক শক্তিশালী শৈব সংগঠন, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজেই, আমাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি দাবি করেছেন। আমাদের তখন ছুটোছুটি করে বহু মানুষকে দিয়ে লেখাতে হয়েছিল যে, অনুষ্ঠানটিতে যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলি নৃতত্ত্বে স্বীকৃত এবং কোনো ধর্মীয় ভাবনাকে আঘাত করার জন্য নয়। সেই সময় অশোকের সঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগ হয় এবং অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে ওঁর লিখিত মতামত আমাদের চাকরি বাঁচাতে সাহায্য করেছিল।

অশোক তখনই বুঝে গিয়েছিল, সরকারি বেতারের সাহায্য নিয়ে অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার তাড়ানোর কাজটা কতটা কঠিন। তখন থেকেই ওঁর মাথায় ঘুরতে শুরু করে কাগজ বের করার ইচ্ছা। আকাশবাণীতে পুরো সময়ের চাকরি করে সেই কাজটা করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭৮ সালের গোড়ায় অথবা মাঝামাঝি কোনও একটা সময়ে স্টেট ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে চাকরির সুযোগ নিতে ও দ্বিধা করেনি। মাইনেটা আকাশবাণীর কাজের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু কাজটা ওর কাছে সম্মানজনক মনে হয়েছিল। ঐ কাজে চাপ ছিল কম, অবসর বেশি—আর সেই অবসরটাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিল অশোক।

অশোকের শূন্যস্থানে বেশ কয়েক মাস পরে যোগ দিয়েছিলেন সুভায় সান্যাল। যতদিন সুভাষ আসেনি, অশোক প্রতিদিন সন্ধ্যেয় আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগে এসে আগের মতই সমস্ত কাজে সাহায্য করত। রেডিওর প্রতি ওর টান, রেডিওর সঙ্গে ওর যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। 'উৎস মানুষ' বেরনোর পর ওর ওপর চাপ বেড়েছিল — কিন্তু ১৯৯০-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত প্রতি মাসে একাধিক অনুষ্ঠানে অশোক অংশ নিত, আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিষয়ক যাবতীয় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় মতামত দিত।

১৯৯০-এর গোড়ায় আমি কলকাতা ছেড়ে বদলি হয়ে যাই গুয়াহাটিতে। সেখানে উৎস মানুষের একটা বড় গ্রাহকগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। কলকাতায় ছুটিছাটায় এলে অশোক আর আমি অনেক সময় আকাশবাণীতেই দেখা করতাম। অসুস্থতা সত্ত্বেও উৎস মানুষ-এর বিষয়ে কখনও উৎসাহের ঘাটতি দেখিনি। হার্টের গণ্ডগোল তো ওর অনেক বছর ধরেই। আমাদের অনেক আগেই যে চলে যাবে তাও জানতাম। তবুও ওর মারা যাবার দুদিন পর যখন আচমকা খবরটা পেলাম বিশ্বাসই হচ্ছিল না। গত কয়েক বছর বইমেলায় অশোকের সঙ্গে অন্তত একবার দেখা হত। সেটাও আর হবে না — সেটা ভাবতেই পুরনো দিনের স্মৃতিগুলি ফিরে আসছে, আর তখনই বন্ধু বিচ্ছেদের জ্বালাটা বুঝতে পারছি।

এক ব্যতিক্রমী বন্ধু

শ্যামল ভদ্র

সত্তর দশকের শেষপর্বে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা মনকে দৃঢ় প্রত্যয়ে কিছু করবার আকাঙ্ক্ষায় কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি, প্রকাশিত হল 'মানুষ'। সম্ভবত বাংলায় বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, যা যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মুখবন্ধে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'যাত্রাপথ সেই বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র জুড়ে', যেখানে প্রকৃতির বুকে মানুষের গড়া সমাজে প্রতিনিয়ত চলেছে বেঁচে থাকার লড়াই—সেই রণক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান পত্রিকাকে হাতিয়ার করে সৈনিকের ভূমিকায় আমাদের অনুপ্রবেশ'। কি অসাধারণ ভঙ্গিতে অশোক পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম প্রকাশেই পত্রিকাটি তার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জনমানসে আলোড়ন তোলে।

সেই সময় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে চারিদিকে হতাশার মধ্যে 'মানুষ' শহর থেকে বহুদূরে গ্রামেগঞ্জে এমনকি আসাম, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যায় শুধুমাত্র সহজ রচনা এবং তখনকার সমাজের নানাবিধ সমস্যাকে তুলে ধরে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে এক বিরাট সংখ্যক যুব মানসের কাছে পত্রিকাটি আন্দোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য করেছি কি অসাধারণ নিষ্ঠা ও যত্নে অশোক প্রতিটি লেখাকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলত। অশোক আমাদের বলতেন, 'শহরের লোককে বিশেষ কিছু হয়ত বলবার নেই, আমাদের পৌঁছতে হবে গ্রামগঞ্জে ওই সাধারণ মানুষগুলোর কাছে"—এখানেই অশোকের হাত ধরে 'মানুষ' পত্রিকা নিজেকে গণবিজ্ঞান আন্দোলনে সামিল করে নিয়েছিল।

'মানুষ' পরে 'উৎস মানুষ'-কে ঘিরে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এক বিরাট কর্মিবাহিনী তৈরী হয়। অশোকের ভাবনা ছিল পত্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তখনকার গণবিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করা। সেই থেকে শুরু হয়েছিল অনুসন্ধানভিত্তিক অযৌক্তিক-অলৌকিক -কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ। প্রতিটি রচনার পেছনে বিভিন্ন মানুষকে উৎসাহিত করা এবং প্রতিনিয়ত তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা যাতে পত্রিকার পাতায় সময়মত প্রকাশ করা যায়।

এইসময়তেই সাপ-স্বাস্থ্য নিয়ে লেখা, পরবর্তী পর্যায়ে দাঙ্গার ইতিহাস ও নারীমুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন লেখা পত্রিকায় পরপর সংখ্যায় প্রকাশিত হত। তখন দেখেছি সংখ্যায় প্রকাশিত হত তখন প্রতিটি বিষয় শুরু করার আগে কি অসাধারণ পরিশ্রম করতে হত তথ্য সংগ্রহের জন্যে। এ বিষয়ে অশোক ছিল সিদ্ধহস্ত। মনে আছে ভূপাল গ্যাস-দুর্ঘটনা, সুন্দরবন সারপ্রকল্প, গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা ইত্যাদি সাময়িক ঘটনাগুলিকে কীভাবে 'উৎস মানুষ' যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য সহকারে প্রকাশ করত — ভবিষ্যতে হয়ত এগুলোই গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। আগেই উল্লেখ করেছি অশোককে বা 'উৎস মানুষ'কে ঘিরে যে কর্মীবাহিনী তৈরি হয়েছিল তাদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'উৎস মানুষ' পত্রিকার প্রকাশনার মান, বিষয়-বৈচিত্র্য এবং প্রকাশভঙ্গি অশোকের সম্পাদনার গুণে খুব সাধারণ পাঠকের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘ দু-দশকের ওপর ওঁর কাছ থেকে অনেককিছু শিখেছি যা পরবর্তী পর্যায়ে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে এবং দীর্ঘদিন এক নিবিড় বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক নির্ভরতা অনেক পথ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে বলা যায় প্রতিবছর বইমেলায় 'উৎস মানুষ' এর উপস্থিতি ও 'উৎস মানুষ' এর বাৎসরিক আড্ডা পত্রিকার পাঠক, লেখক এবং বেশকিছু মানুষকে একজায়গায় নিয়ে আসত এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানেই অশোকের প্রাঞ্জল বক্তব্য ও টীকাটিপ্পনী সবাইকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। বইমেলার মাঠে দেখেছি অশোককে ঘিরে বিভিন্ন মানুষজনের আড্ডা -এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা যা দূর থেকে উপভোগ করতে হত। বিগত দশকে বহু প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা ও তার সংশ্লিষ্ট মানুষজনকে আমরা দেখেছি। কিন্তু অশোকের মতো মানুষের উপস্থিতি আর ছিল বলে মনে হয় না। বহু সংগঠন এবং সামাজিক নানা কাজকর্মে নিযুক্ত অনেক মানুষজন 'উৎস মানুষ'কে ঘিরে আবার নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা পেয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে এইসব কাজে অশোককে তার নিজস্ব কিছু ত্রুটির জন্যে ভুগতেও হয়েছে এবং আমরা, যারা ওর কাছাকাছি ছিলাম, দেখেছি আবার তাদেরকেই নানাভাবে সাহায্য করতে। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে বৃহৎ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাগুলি শুধু নীরবে অনুভব করা যায়। তাকে প্রকাশ করা হয়তো যায় না। সেই কারণে ব্যক্তি অশোক এবং 'উৎস মানুষ'-এর অশোকের মধ্যে একটা ফারাক ছিল বৈকি।

পত্রিকার লেখা সংগ্রহে বেশ সমস্যা হত। অশোক নিজেই বিভিন্ন ছদ্মনামে যেমন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনসূয়া মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি নামে লিখত। পত্রিকার সম্পাদনা একটি দুরূহ কাজ এবং বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখার গুণমান বিচারে অযোগ্য প্রমাণ হলে অবলীলায় তাকে বাদ দিয়ে দিত। কখনও অনেক লেখকদের কুম্ভিলকবৃত্তিকে যথাযথ বাক্যবাণে বা পত্রাঘাতে অস্থির করে তুলতে কসুর করত না। এরকম কত ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, যা আজও স্মৃতিতে অমলিন। আরেকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে এ লেখার ইতি টানব। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শংকর গুহনিয়োগীর একটি লেখা 'পরিবেশ ভাবনা' উৎস মানুষের দপ্তরে পৌঁছেছিল। অশোক লেখাটিকে অতি যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে পরবর্তী যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য তৈরি করে সেই মুহূর্তে খবর আসে শংকর আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। অশোককে ভীষণভাবে ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম। ও বলেছিল আর বোধহয় কিছু করতে যাওয়া সহজ কাজ হবে না।

তারপরে ১৯৯২-এর জানুয়ারি প্রথম সংখ্যায় শংকর গুহনিয়োগীর উপর বেশ কটা লেখা শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশিত হয়। দেখেছি এক সংবেদনশীল প্রতিবাদী মন কীভাবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু করবার জন্য ছটফট করত। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দেখতে গিয়ে বহু কথাই মনে আসছে, যার সবকিছু এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং ওর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করার সাধ্যও আমার নেই। তবে এটুকু বোধহয় বলা যেতে পারে, ওর মত সচেতন মন ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে এমন আর কাউকে দেখতে পাই না। অশোককে ঘিরে বা উৎস মানুষকে কেন্দ্র করে যে পরিবার গড়ে উঠেছিল তারাও বোধহয় ওঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেনি খুব সম্ভবত ওঁর নিজের পরিবারও নয়।

অশোক আছে, কারণ 'উৎস মানুষ' আছে

সৌমেন নাগ

আমার প্রিয় বন্ধু অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই— বিশ্বাস করতে পারছি না। সে কথাটা তাই কলমে আসছে না, কোনদিনই আসবে না। কারণ ও যে না থেকে পারে না।

অশোক আমার বন্ধু। আমার থেকে অনেক খারাপ মানুষেরও যেমন বন্ধু তেমনি আমার থেকে অনেক অনেক ভালো মানুষের বন্ধু। কারণ খারাপ, সাধারণ ও ভালো সব মানুষই জানতে চায় তার উৎসকে। সেই উৎসের ঠিকানা মানুষের মনের দরজায় পৌঁছে দেবার জন্যই অশোকের হাতে জন্ম নিয়েছিল 'উৎস মানুষ'।

অশোক আমার বন্ধু — এটা আমার গর্ব। আমার এক অহমিকার ঘোষণা। তাই সে কৃতজ্ঞতার ডালি থেকে প্রথম কৃতজ্ঞতার পাপড়িটা অশোকের জীবনসঙ্গিনী মিত্রা (বন্দ্যোপাধ্যায়) রায়কে দিতে হয়। কারণ ওর দৌলতেই উত্তর বাংলার এক প্রান্তিক শহর শিলিগুড়িতে নাম না জানা ও টিভিতে দেখা সৌম্যদর্শন মানুষটার সাহচর্য লাভ করি।

অশোক মানুষকে ভালবাসত বলেই প্রকৃতিকে এত গভীর ভাবে ভালোবাসতে পেরেছিল। উত্তরবঙ্গের সবুজ সাম্রাজ্য তাকে টানত। লাভ হত আমার। প্রায় প্রতি বছরই ওকে পেতাম উত্তর বাংলার এই প্রাকৃতিক সবুজ আঁচলে।

সাম্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান অশোকের জীবনবোধে আবেগের রথের সারথী ছিল যুক্তি। লড়াইয়ের অস্ত্র ছিল অন্ধ সংস্কারের শিকলের বন্ধন থেকে যুক্তির সংকল্প। হাতিয়ার হয়েছিল 'উৎস মানুষ'।

অশোক নেই একথা বলতে পারছি না। কারণ তার যে উৎস মানুষ আছে। অশোকের মতন আমিও আত্মায় বিশ্বাস করি না, তবু বিশ্বাসকেই যে বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসকে বুকে রেখে সেই প্রত্যয়ে ঘোষণা করতে পারি—'অশোক, আমরা আছি। 'উৎস মানুষ' থাকছে, থাকবে। সেখানেই যে অশোক আছে এবং থাকবে।

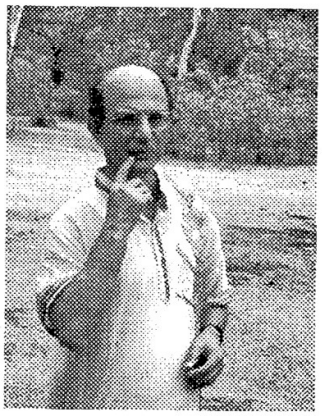

এখনও মনে ভাসে ওর সেই উজ্জ্বল চেহারা

সমর বাগচী

১৯৬০-এর দশকের শেষ কিম্বা ৭০-এর প্রথমে এক সুদর্শন যুবক সদ্য এম এসসি পাস করে যোগ দিল বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে (বি আই টি এম) যেখানে আমি ছিলাম ডিরেক্টর। উজ্জ্বল চেহারা, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবক। ভারী গলা। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো মানুষ। কিন্তু পরিচয় গভীর হওয়ার আগেই মিউজিয়াম ছেড়ে অন্য কাজে যোগ দিল। ও ছিল লাইভ লেকচারার পোস্টে। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, ও এই সামান্য কাজের মানুষ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি সবসময় সৃষ্টিশীল মানুষকে এইরকম কাজ ছেড়ে যেতে উৎসাহিত করতাম। তারপর ওর সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যায়।

উৎস মানুষ প্রকাশিত হওয়ার পর আবার ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে বাড়ে। মনের ঘনিষ্ঠতা। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতির দেউলিয়াপনা ওকে খুবই পীড়িত করত। একসঙ্গে বসে এইসব বিষয়ে খুব যে একটা আলোচনা করেছি তা নয়। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হত। ও আমাকে কোনো ভাল লেখা পড়লে তার কপি পোস্টে বা ই-মেলে পাঠাত। একবার 'পরস্পর' নামে এক নাম না জানা লেখকের একটা গল্প পাঠাল পোস্টে। কত মানুষকে শুনিয়েছি ওই গল্প। ওই গল্পের মানবিকতা ওকে মুগ্ধ করেছিল। প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী রাজনীতির হৃদয়হীনতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়; বীভৎস হিংসা ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল বোধহয়! একেই শরীর খারাপ, তার ওপরে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় ওর শরীর ও মনকে বিপর্যস্ত করেছিল। তার মধ্যেই ও জ্বলে উঠত উৎস মানুষকে দাঁড় করাতে হবে। মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের জন্য। বড় কঠিন কাজ। সমাজের সর্বস্তরে যে পচন দেখা দিয়েছে, প্রকৃতির যে হনন চলেছে বিরাট আকারে তাকে ঠেকানো এক দুরূহ কাজ। অশোক চলে গেল। ওর চলে যাওয়াতে সুস্থ চিন্তার জগতে এক অত্যন্ত ভালো মানুষকে আমরা অকালে হারালাম। আমরা যে যেখানে আছি, যতটুকু পারি, ভালো কাজ করি। তবেই অশোকের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা দেখানো হবে।